ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক বিপ্লবের প্রেক্ষিত বুঝতে হবে

(প্রকাশিত শিরোনাম: আওয়ামী লীগ নিজেই রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে)

– ড. হাসনান আহমেদ

ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক বিপ্লব প্রথম দিকে কোটা-সংস্কার থাকলেও, এখন একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে; তাই সংস্কারের ট্রেনকে গন্তব্যে নেওয়াটাই যৌক্তিক হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারের কোনো মানে হয় না। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতি আশানুরূপ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বিপ্লবের পূর্ণতা এখনো বাকি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতার সাথে পদাসীন উপদেষ্টা পরিষদের মনকষাকষি ক্রমশ বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া বেশকিছু উপদেষ্টা ও তাদের কায়েমি আস্থাভাজনদের প্রচ্ছন্ন সম্পৃক্ততা বিপ্লবের অভিমুখীতাকে পথভ্রষ্ট করছে। এতে লাভবান হচ্ছে ভারতের চিহ্নত গোলাম– পরাজিত পতিত অপশক্তি। আমরা বাস্তবতা দেখে নিরুৎসাহিত হচ্ছি। তবে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটা সুনির্দিষ্ট গতিপথ গড়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা দুর্ভাগ্যজনক। একটা সত্য আমার চোখে ধরা পড়েছে যে, ছাত্র-জনতার এ বিপ্লব হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী এবং মুজিববাদী দেশবিরোধী অপশক্তিকে চিরবিদায় জানিয়ে দেশের জন্য স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত টেকসই দেশোপযোগী আদর্শকে বেছে নিতে চেয়েছে। বিএনপি ও জামায়ায়ে ইসলামী এ মনোভাব বুঝতে না পারলে, সেটা তাদের অপারগতা। অন্তর্বর্তী সরকারেরও কোনো কোনো উপদেষ্টা এখনোও এটা আঁচ করতে পারেননি। অন্তত তাদের কোনো কোনো ব্যক্তির কাজ-কারবারে তা প্রমাণ করে। আরেকটা বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের বেশি বোঝার প্রয়োজন ছিল, তা করতে তারা কেন বিলম্ব করছেন আমার বোধগম্য নয়, তা হচ্ছে: বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার আনার প্রয়োজন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। উভয়ের মধ্যে বাস্তব সম্পৃক্ততার বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে। বিষয়টার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে আমরা ঢিমে-তেতালা তালে এগোচ্ছি; এ কাজও পরিণামে ব্যর্থ হতে চলেছে। এর মধ্যে বিএনপির একটা ক্ষুদ্র অংশ যারা হিন্দুত্ববাদের জোয়াল টানতে আগ্রহী তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ বোঝার ঘাটতি রয়ে গেছে।

দেশকে এ পর্যায়ে আসতে বাধ্য করেছে পার্শ্ববর্তী দেশের সেবাদাস পতিত সরকার। গৌরচন্দ্রিকা দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলি। চোখ বুজলে মনে হয়, সেদিনের কথা। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা আমার মোটামুটি জানা। মানুষের মনোবল ছিল অটুট; প্রায় সব দল দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতো। তাই তারা একজোট হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। এটা ছিল সামষ্টিক প্রচেষ্টা। শেখ মুজিব ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শেখ মুজিব দেশে ফেরার পর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ত্যাগ বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন; সেজন্য যে স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে জনসাধারণ স্বাধিকার অর্জনে প্রাণপণ যুদ্ধে নেমেছিল, জনগোষ্ঠী যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল ও জীবন দিয়েছিল, তিনি দিনে দিনে সব স্বপ্নাবিষ্ট আশা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধ এদেশের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে সাধারণ ভাবুক মানুষের মনে এ ধারণা পরিস্কার হয়েছিল যে, স্বাধীনতার নামে ভারত সরকার পাকিস্তানকে নিজস্বার্থে দুভাগ করে দিল। বাংলাদেশ পেল নামমাত্র স্বাধীনতা ও একটা নতুন পতাকা। একটা আশ্রিত রাজ্যের মতো আমরা সবকিছুতে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেলাম। এতে বাংলাদেশ শাসন ভারতের জন্য সহজ হয়ে গেল। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে'। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশকে পরিবর্তন, একদলীয় বাকশালী শাসন, রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর প্রকাশ্য অত্যাচারে বিচারবহির্ভূত

গুম-হত্যা ও নির্যাতন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে সুখ-শান্তির আশা ধূলিসাৎ করে দিল। সে সত্য ইতিহাস লিখে বর্তমান প্রজন্মকে বাস্তবতা অবহিত করার সময় এখন এসেছে। অবশেষে দেশের অবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে কিছু মধ্যম-পর্যায়ের বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তা, যারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাদের হাতে '৭৫-এ শেখ মুজিবের শাসনের অবশ্যম্ভাবী পতন হলো। কারণ সরকার ভারতের পরামর্শে প্যারামিলিটারি-রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীকে সুযোগ-সুবিধা বেশি দিতে থাকলো; তাতে সামরিক বাহিনী অবহেলার পাত্র হয়ে ক্রমশ ভেঙে যাবার আতঙ্কে ভুগছিল। অনেক সামরিক অফিসার ও সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের সকল বিষয়ে দেশ পরিচালনায় খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত, অরাজকতা ও ভারতের কাছে নতজানু নীতি মেনে নিতে পারছিলেন না। শেখ মুজিব ও তার বাম-ঘরানার দোসররা এদেশের একত্ববাদী মানুষকে ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির কাছে জিম্মি করে ফেলেছিলেন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিব দেশ পরিচালনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্বাক্ষর প্রতিটা পদে পদে রাখছিলেন।

৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের সময়ে বাম দল প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘাড়ে চেপে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে সামরিক আইন ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশকে ইসলামি ধারায় উন্নয়নের পথে পরিচালনা করেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, মুজিববাদী কুচক্রীমহল ও তাদের সম্প্রসারণবাদী প্রভুর যোগসাজশে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জীবন দিতে হয়। এর মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা থেকে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ও মুজিববাদ ব্যর্থ হয়ে কালের অতলে তলিয়ে যায়। এদেশের বাম ঘরানার কমরেডদের মধ্যে অনেক বিভাজন ও দলভাগাভাগি হতে আমরা অনেকবার দেখেছি। মুজিববাদের উত্থান ও পতনও শেখ মুজিবের ঘাড়ে বাম কমরেডদের ভূত চেপে বসার কারণেই হয়েছিল। বর্তমানে এদেশ এবং বিশ্বব্যবস্থা থেকে এ মতবাদ বিলীনপ্রায়। এরও যথেষ্ট কারণ আছে; তবুও এদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে এদের একটা জোট এখনও প্রতিটা নীতিনির্ধারণী কাজে সক্রিয়। কিন্তু কমরেডরা হিউম্যান-সাইকোলজিতে দুর্বল হওয়ায় আজও তারা বিশ্ব-রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তাদের বিতাড়িত হবার কারণ, পৃথিবীতে মানুষসৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে অপারগ। তারা মানুষকে ভোগবাদী নিছক একটা বুদ্ধিমান প্রাণি হিসেবেই গণ্য করে। কালের স্রোত সদা সামনে প্রবহমান। প্রতিটা প্রাণি ও অস্তিত্ব সময়ের এ স্রোতে সন্তরণশীল।

'৯৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে অপরিপক্ব শেখ হাসিনা ওয়াজেদের দেশ-চালনা বুঝে উঠতেই সময় পার হয়ে যায়। তারপর অনেক কৌশলে ভারতের সহযোগিতায় দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে। আবার সেই ছদ্ম-একদলীয় শাসন ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু। দেশের পুরো অর্থনীতি ধ্বংস; নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগকে নিয়ে নিখাদ দলবাজি, গণহত্যা, ভারতীয় গোপন বাহিনী দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে দেশচালনা প্রভৃতি পুরোপুরি চলতে থাকে। দুর্নীতি, বিচারহীনতা, নির্যাতন, খুন-গুম, কোষাগার ও ব্যাংক লুটপাট, নিজের ছেলেমেয়ে-আত্মীয়স্বজনসহ দলীয় লোকজনকে অবাধে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থসম্পদ তৈরির সুবিধা করে দেওয়া ও বিদেশে পাচার করতে দেওয়া; প্রভূর দেশের হিন্দুত্ববাদী শাসনের আদলে প্রভূর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় এদেশেও অনুরূপ শাসন ও রামরাজত্ব কায়েম, তাদের গোপন বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপে বাংলাদেশি জনগণকে ভোটের অধিকারহীন শাসন দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর ক্রমবর্ধিষ্ণু গতিতে দুর্দণ্ড প্রতাপে চলতে থাকলো। এতে প্রভূও খুব খুশি। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত স্বপ্ন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের হাত দিয়েই প্রভূর মনবাঞ্ছা প্রায় পূরণ হবার উপক্রম হলো। শেখ হাসিনা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে প্রভূ তোষণে মরিয়া হয়ে উঠলেন। এদেশে গণতন্ত্র থাক বা না-থাক, শিক্ষার মান অধঃপাতে যাক বা অর্থনীতি ধ্বংস হোক, তাতে প্রভূর কোনো যায়-আসে না। বরং এসব চলক যত নিচে নামে গুরুর শাসন পাকাপোক্ত করা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বস্তুবাদী মনোভাবে পরিণতকরণ, সেবাদাসের মাধ্যমে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত প্রক্রিয়া তত সহজ হয়। সহ্যসীমার

বাঁধ যখন ভেঙে পড়ল, প্রকৃতির প্রতিশোধ শুরু হয়ে গেল। ছাত্র-জনতার বিপ্লবে গণহত্যার রক্তে শেখ হাসিনার তক্ত কয়েকদিনের ব্যবধানে ভেসে চলে গেল। শেখ হাসিনা গং অবশেষে বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হলো। এ বিপ্লবে সাথে থেকে সাহায্য করেছে দীর্ঘ বছর ধরে সংগ্রামে লিপ্ত ও অত্যাচারিত-নিষ্পেষিত বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীরা। শেখ হাসিনা প্রভূর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পিছনে ফেলে রেখে গেলেন কমপক্ষে ১৫০০ ছাত্র-জনতার লাশের পাহাড় ও হাজার হাজার ছাত্র-জনতার জীবন্মৃত আহাজারি।

আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী কর্ম ও চিন্তা-চেতনা দেখলে একে কোনো রাজনৈতিক দল বলা যায় না; লুটপাট-সন্ত্রাসী কার্যক্রম, প্রভূর কাছে দেশ লিজ দেওয়া ছাড়া এর মধ্যে রাজনৈতিক কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে বিশাল ঋণের টাকাসহ সর্বস্ব লুট করে ভিক্ষার ঝুলি এদেশের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়েছে। দায় এসে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ও সাধারণ মানুষের ওপর। যদি কেউ এদেশের মঙ্গল চায়, আওয়ামী লীগ নামে যে এদেশে কোনো দল ছিল, ভুলে যাওয়াই সমীচীন। বিএনপি-জামায়াত-অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবেই ভাবুক কালবোশেখি ঘন-কালো ঝড়ো মেঘের কাছে সুশীতল-সুনির্মল বাতাস আশা করা চিরকালই অবাস্তব। স্বাধীনতা রক্ষার বিজ্ঞাপনের ধুয়োজারি গেয়ে দেশ লুটপাট ও 'মতলববাজ বন্ধুর' রামরাজত্ব কায়েম আর কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

সম্ভবত '৯১ অথবা ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে যাবার পর ক্ষোভের সাথে শেখ হাসিনা প্রকাশ্য বলেছিলেন, 'এক দিনও সরকারকে শান্তিতে থাকতে দেবো না'। বর্তমান অবস্থাও তাই। এদেশের যত লক্ষ কোটি টাকা নিজে এবং নিজের লোক দিয়ে আত্মসাৎ করেছে, তার একটা অংশ অন্তর্বর্তী সরকার ও পরবর্তীতে কোনো রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপ দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন এবং বিদেশে সরকারের নামে অপপ্রচার চালানোর কাজে লবিস্টদের নিয়োগে নিশ্চিতভাবেই ব্যয় হবে; হিন্দুত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী ভারতও এদেশ জঙ্গিদের অভয়ারণ্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের স্বকল্পিত বুলি বিদেশে অপপ্রচার করতে কোনো ত্রুটি করবে না। এতে মুসলিমবিদ্বেষী মুরব্বিদের সমর্থনও নিশ্চয়ই পাবে; কারণ এটা বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের একটা অংশ। তাছাড়াও ভারত মুসলমানদের বহিরাগত শত্রু বলে সেই আদিকাল থেকে গণ্য ও প্রকাশ করে আসছে। তাদের পরীক্ষিত দাস ছাড়া কাউকেই তারা বিশ্বাস করবে না। নামে মুসলমান, বামপন্থী ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তিও তাদের সেবাদাস। যে 'মুসলমান কোপাও' অভিযানে যোগ দিতে পারে না, সেই জঙ্গি। আমাদের মুসলমান হয়ে জন্ম নেওয়াটাই তাদের চোখে একটা অপরাধ। এসব কঠিন বাস্তবতা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও আসন্ন রাজনৈতিক সরকার কতটুকু সজাগ? এতকিছু করার পরও তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে বিএনপি-জামায়াত ও অন্তর্বর্তী সরকার গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর। এটা দেশের জন্য আত্মঘাতি ছাড়া আর কিছু নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতি মানেই নৈরাজ্য-বিভীষিকা-লুটপাট, দেশবিক্রি-গণহত্যা ও মিথ্যাচার; সে অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পরই এদেশপ্রিয় মানুষের অনেক হয়েছে। আবার সাড়ে ১৫ বছর ধরেও প্রমাণিত হলো। সবাইকে মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগ নিজেই এদেশে রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে। এখন ১৪ দল বাদে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত অন্তর্বর্তী সরকারের সে চৈতন্যোদয় সময়মতো হলেই হয়। বার বার পরীক্ষিত আওয়ামীলীগের দেশ-ধ্বংসাত্মক ও লেন্দুপ দর্জিমার্কা কর্মকাণ্ড এদেশের প্রতিটা দেশপ্রেমী মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে শংকিত করে তোলে। তিন সন্তানের জননীর কুমারিত্ব পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর আর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

বুঝতে হবে হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির দোসর এবং এদেশের নাস্তিক্যবাদী শক্তি এদেশের নব্বই শতাংশ মুসলমানের অস্তিত্ব ধ্বংসকারী ফ্যাক্টরের প্রতিভূ। এ ভুত যদি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে চেপে বসে, এ জাতির উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। তাই ইসলাম-বিদ্বেষী বাম ভুতের কুমন্ত্রণায় মাইনাস-টু ফরমুলা বা নতুন দল গঠন প্রক্রিয়া এড়িয়ে সুস্থ বুদ্ধি করাই অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য শ্রেয়। অনেকবার লিখেছি, অন্তর্বর্তী সরকারের পর দেশে জাতীয় সরকার আসা প্রয়োজন। আমি এদেশে অবাধ গণতন্ত্রের আপাতত পক্ষে নই। সময়ই বলে দেবে কখন অবাধ গণতন্ত্রের চর্চা করার সময়। অন্তর্বর্তী সরকারকে অজনপ্রিয় করার পেছনেও নিজেদের মধ্যে ও নির্বাহী বিভাগে ছদ্মবেশী লোকজন আছে। বরং সরকারের শুধু দেশ-সংস্কারসহ সদ্যকৃত গণহত্যার বিচার করাই যথেষ্ঠ হবে না; আনসার বিদ্রোহের নামে সেনাকর্মকর্তা হত্যাযজ্ঞ, শাপলাচত্বরের হেফাজতে ইসলামের গণহত্যার বিচারও করতে হবে। সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অবশিষ্ট দলগুলোসহ দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়ে অন্তত সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

(১৩ ডিসেম্বর ’২৪ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত, পত্রিকা আংশিক পরিবর্তন করে ছাপিয়েছে)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ; web: pathorekhahasnan.com